তৃতীয় অধ্যায়

সমকালীন প্রেক্ষিতে রণবীর পুরকায়স্থের ছোটগল্প

ছোটগল্পের আবির্ভাব বেশি দিনের না হলেও তাকে সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্যকে নানাভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ছাড়া অন্য কোথাও এত বেশি প্রভাবিত আছে বলে সন্দেহ হয়। মধ্য যুগে লক্ষ করা যায় অবৈধ প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যা। আধুনিক সাহিত্যে পাঠে বেশি লক্ষ করা যায় মানুষ পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির ফলে। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্যাখ্যা ছিল নির্দিষ্ট কিন্তু বর্তমান কালে তার প্রভাব ঘটেছে। লেখকেরা তাদের লেখা তুলে ধরেছেন বর্তমান সমস্যাকে। এইসব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জেনে তা ফুটিয়ে তুলেছে ছোটগল্পে। লেখক জেনেছেন বর্তমানে মানুষের জীবন অনেক জটিল। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে বৈধ-অবৈধ বোধ। দিন-দিন অনুভূতি, মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে। ফলে জন্ম নিচ্ছে হাজার হাজার সমস্যা। মানুষের এক ঘেঁয়েমি জীবন থেকে সরে আসার জন্য আহ্বান করে নতুন কিছু। সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এইসব আধুনিক মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদেরকে পাশ্চাত্য প্রভাবে অনেকটাই পাল্টে দিয়েছে। এই আধুনিকতাকে অস্বীকার করা যাবে না, এর ফলে আমাদের সমাজকে অনেকটা পাল্টে দিয়েছে। তার ভাল-মন্দ দুটো দিকেই আছে। সময়ের সাথে আমাদের বদল হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থের কয়েকটি গল্পে আছে নারীর সৌন্দর্য ও রূপ। তার গল্পে দেখা যায় পুরুষ চরিত্র নারীর রূপের কাছে পথ হারিয়েছে। বিবাহিত পুরুষ অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তা সমাজের কাছে অন্যায় বা

সমস্যা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যে দেখা যায় তিনি নারী পুরুষের অবৈধ প্রেমের ছেদ টানেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। তার গল্পের চরিত্ররা সম্পূর্ণ নির্মাণ করে মনস্তত্ত্বের উপর। রণবীর পুরকায়স্থের গল্পেও দেখি নারী স্বাধীন ও পরাধীন। যারা পরাধীন নারী তারা চেয়েছে সামাজিক স্বীকৃতি, সম্মান ও মর্যাদা। তাদের মনে ঘটে চলেছে অনবরত নানা প্রতিক্রিয়া। আর যে নারীরা স্বাধীন তারা পুরুষের ভালোলাগা বা মন্দ বোধে ততটা তাড়িত নয়, তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মন রয়েছে।

বরাক উপত্যকায় ছোটগল্পের প্রকাশ ঘটে লিটল ম্যাগাজিনের উপর নির্ভর করে। ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ে বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এর অনেক আগেই বৃহত্তর বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্প ছড়িয়ে পড়েছে। বহমান জীবনের টুকরো টুকরো ছবির গ্রন্থনা ও সার্থক ছোটগল্পের চমৎকার দৃষ্টান্ত হলো— 'মিনির হাসি' ও 'রঞ্জন আসছে'। সেইজন্যই নির্দিষ্ট প্রকরণের দরকার হয়না এবং গুরুগম্ভীর কাহিনির প্রয়োজন নেই। তবে বিশেষ দরকারি হয়ে উঠেছে পরিশীলিত লিখনশৈলীর। রণবীর পুরকায়স্থ সাহিত্য রচনার শুরু থেকেই অতিমাত্রায় শৈলী সচেতন। তাই তার ছোটবেলার পড়া 'Simple Pleasure' এর বয়ান পড়ে। তাই 'মিনির হাসি' ছোটগল্পে দেখা যায় দ'শ এগারো নম্বর ঘরের চাবি দিয়ে দু'শ বারো নম্বরের দরজা খুলে যায়। আবার লক্ষ করা যায় কলকাতার মহানাগরিক মূর্খতা। আসামের ধুরবীর ও শিলচরের দূরত্ব যে কত তা জানে না। মহানাগরিক রমানাথ চক্রবর্তী বলে ''আসাম যাব একবার ধুবরীতে আমার এক বন্ধু থাকে, সমীর সেনগুপ্ত, খুব ভালো তবলা বাজায়, ওর বাড়ীতেই যাব, তখন দেখা হবে নিশ্চয়?''[১] গল্প কথকের সমুদ্র দেখার বিষয়ই হয়ে ওঠে লঘু কার্নিভালের উপজীব্য। কানামাছি খেলার মতো ডাক দেয়— ''আয়রে আমার সাগর''[২]। এতে শৈশব ও কৈশোরের টাটকা সুবাতাস বয়ে যায়। কিংবা বিখ্যাত

শিশুতোষ কথা বীজের উল্লেখ পাওয়া যায় ঘাসের আঁটি, বাঘ ও ছাগলের গল্পে। আবার বয়স্কবেলায় গোলা পাকানো মজার ছোয়া লেগেছে এল.আই.সি. আর এল.আই.জি. নিয়ে। 'মিনির হাসি' গল্পটাই লেখক এক বিনিসুতোর মালায় গেঁথেছিল গল্পহীন গল্পের নতুন বিন্যাসে তৈরি করেছে গল্পকার এই গল্পটি।

'মিনির হাসি' ছোটগল্পে কথকের উপর নির্ভর করে মিনি। মিনির রহস্যময়তা তাকে আরো বিব্রত করে তোলে। মিনি কোনো ব্যাপারেই তাকে তাড়া দিয়ে উত্তেজিত করে না, তার সহানুভূতি বোধ আছে। ঝড়বৃষ্টির দিনে কথক ও মিনির সিঁড়ির নিচে মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিনির কষ্টের জন্য কথক নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করেছিলেন। একদিন মিনি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন যে তার পাড়ার লোক নাম তার রমানাথ চক্রবর্তী। মিনি কথককে বলে— ''এই রমাদা, রমানাথ চক্রবর্তী তোমাকে বলিনি? মিনি কখনও বলেনি, তবু বলতে হলো— আপনার কথা খুব শুনেছি মিনির কাছে। আমার উত্তর শুনে মিনি হাসে। আমার কি অন্য কিছু বলা উচিত ছিল?''[৩] এতে বোঝা যায় গল্প কথক মিনির সম্মান রক্ষা করার জন্য সঠিক কথা বলেনি, কথকের দৃঢ় বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রমানাথ চক্রবর্তী কথক ও মিনির জন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। কথকের এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো এই যাত্রাকালীন সময়ে। মেয়েছেলে থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। মিনির চরিত্রের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সে জোড়ে হাসে না। তার হাসির কোনো আওয়াজ নেই, তার ঠোঁট ও চোখের মধ্যে দিয়ে সব বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু গল্পকথকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। মিনি কথককে কোন কাজেই তারা দিতো না, সে নিরব ভাবে কথককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। কারণ, না বলার মধ্যেই অনেক কথা লুকিয়ে আছে। কথকের একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায় অন্য পরিবেশে গেলে ঠাণ্ডাকে গরম, গরমকে ঠাণ্ডা অনুভব হয়, এতে বোঝা যায় তার মানসিক চাপ সৃষ্টির ফলে

এরকম হয়। তার ভাবনা শুধু মিনিকে নিয়ে, যাতে মিনির কোনো কষ্ট না হয়। কথকের এক নতুন অভিজ্ঞতা হল মেয়ে মানুষ পাশে থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়, যে কোনো লোক সাহায্য করতে আসে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ফলেই এই সুবিধা মেলে। মিনি অনেকটা পরিপাটি মেয়ে ও দায়িত্ববানও বলা যায়। তিনি ঘরটি সুন্দরভাবে সাজিয়ে ছিলো এবং নির্দিষ্ট সময়ে কথককে ডেকে ছিল। কারণ সূর্য উঠার আগে সমুদ্রকে কেমন দেখায় তা দেখবে বলে।

গল্প কথকের ছিল কিছুটা বিলাস প্রবণ মানসিকতা— ''কোলাঘাটে চা খাওয়া হলো না, শরৎ সেতুও দেখা হলো না, তাছাড়া বাস জার্নির মেজাজই আলাদা।''[৪] ইচ্ছে করলে যেতে পারতো তাতে মিনি কোন বাধা দিতো না। খেজুরের রস সম্পর্কে কথকের কোন ধারণা নেই। তবে মিনি তাকে বলে— ''খেজুরের রস গো! এখানে খুব হয়, বেলা হলে তাড়ি হয়ে যায়।''[৫] মিনি রস সম্পর্কে সবি জানে। কারণ এর আগে রস সম্পর্কে সে জেনেছে। তারা দু'জন একই সঙ্গে থাকাকালীন কিছু খাবারের দরকার হলো। তখন কথক কিছুটা চিন্তিত হলো মিনিকে নিয়ে। তাদের হাতে তেমন খাবারের ব্যবস্থা ছিলো না। তাই কথক নিজে অনুশোচনা করছে।

'রঞ্জন আসছে' গল্পে বাবু চরিত্রটির পুরোনো বন্ধু ছিল স্বাতী নামে একজন মহিলা। এই স্বাতীর সঙ্গে কথা বলে ও শুনে আনন্দ উপভোগ করত বাবু। আগের স্মৃতি যে আর ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। স্বাতীও ভালো করে দেখলো বাবুকে দিন দিন বদলে যাচ্ছে। বাড়িতে কথা দিয়ে এসেছিল তার স্ত্রী মিনিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার। কিন্তু পুরোনো বন্ধু স্বাতীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ির কথা ভুলেই গেলো। কারণ পুরোনো স্মৃতি পুরোনো বন্ধু একই সঙ্গে স্মৃতি চর্চা করলে বর্তমানকে ভুলিয়ে দেয়। তখন তারা

অতীতের জগতে চলাচল করছে। বাবুও তার স্ত্রী মিনি নিজেদের মধ্যে সন্দেহের বাসা বেঁধেছে। তাই বাবুও তার অবিশ্বাসী স্ত্রীকে সহ্য করতে পারে না। মিনিও বাবুকে সহ্য করতে পারে না, সন্দেহের চোখে দেখে। বাবুকে একা একা কোথাও যেতে দেয় না, এ ব্যাপারটি বাবুকে অসস্তি করে তোলে। বাবু মিনিকে নিয়ে পুরোনো স্মৃতির কথা ভাবছে— ''আসামের গাঁইয়া কলকাতা গেছি। এই গাঁইয়া লোকটাকে শহুরে করার কত চেষ্টা করছো তুমি। তোমার বন্ধু বাহিনী নিয়ে কত জায়গা ঘুরে দেখিয়েছো। বেলুরমঠে বাদাম খেতে দাও নি। আর একদিন শুধু তুমি আমি জয়গাছিতে গিয়েছিলাম তোমার এক বান্ধবীর বাড়িতে। হাওড়া স্টেশন থেকে সন্দেশ কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, তুমি দাওনি, বলেছিলে ওসব এদিকে চলে না। তোমার শাসন তখন এত মধুর ছিল।''[৬] স্ত্রীর কাছে স্বামীর যদি চারিত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে সংসারে ফাটল ধরবে অনিবার্য্য ভাবে। তাই আজ বাবুও স্বাতীর সম্পর্কের ফাটল দিন দিন বেড়েই চলেছে। মিনিকে নিয়ে বাবুর মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। মিনি ছিল কলকাতা শহরের মেয়ে বাবুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না, তার কাছে নানা খটকা লাগছে।

কলকাতার ছেলে রঞ্জন মিনির বন্ধু। রঞ্জনকে বাবুও পছন্দ করে বেশ। মহানাগরিক রঞ্জন ও মিনি এরা কেউ কখনো হারতে চায় না। শহুরে ছেলে মেয়েরা সোজা ভাষায় কথা বলতে চায় না। মুখপুড়ি উল্লুক শুটকি হোৎকা এসবই এদের সম্বোধন। বাবুর বাড়িতে রঞ্জন আসার খবরটা নিয়ে তারা দু'জন উৎফুল্ল হয়ে আছেন। রঞ্জন আসার কোনো খবরই ছিল না, মিনিকে উত্তেজিত করার জন্য বাবু তা বলেছিল। তার জন্য বাবু মিনির হাত ধরে বার বার বলতে থাকে— ''আমার ভুল হয়ে গেছে মিনি।''[৭] মিনি কলকাতা যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করলে বাবু বলে রঞ্জনের সঙ্গে যেতে। মিনি বলে— ''কেন যাবো? রঞ্জনের সঙ্গে কেন

যাব?"[৮] তারা দুজনেই পাওয়া আর না পাওয়ার বেদনাই অনুভব করেছিল। মিনির কথা শুনে বাবুর মনে চেতনা জাগলো, যে রঞ্জনের সঙ্গে যাওয়া উচিত নয়। বাবু মিনিকে নিয়ে সিনেমা দেখার ইচ্ছে থাকলেও বেড়াতে পারে না, কারণ মিনি তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চায় না। বাবু স্বাতীর সঙ্গে আড্ডা দেয় তা মিনি জানতো, যে কথা আজ বাবুকে স্পষ্ট বলে দেয়। যে ভয় বাবুর মনে এতদিন বাসা বেঁধে ছিল তা বাবুর সমস্ত ভয় আজ দূর হয়ে যায়। মিনি এতে অস্বাভাবিক কোন আচরণ করেননি। তাই মিনির প্রতি বাবুর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। মিনি ও বাবু দুজনেই নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়। তাই মিনি বাবুকে বলে— ''আমি তোমাকে সুখ দিইনি একটুও কেমন পাগলাটে হয়ে গিয়েছিলাম।"[৯]

'অনিশ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই বরাক উপত্যকায় ছোটগল্পের প্রকাশ। কাছাড়ের গল্প সম্পর্কে কিছু কিছু আক্ষেপ বাণী উচ্চারিত করে ছিলেন লেখক রণবীর পুরকায়স্থ। কবিতার চর্চা কাছাড়ে ভালো বলেই গল্পের হাল বেশি নৈরাশ্যজনক— ''কাছাড়ের সাহিত্যে শুয়োরাণী কবিতা কবিতায় প্রতাপ বড্ড বেশি তাই দুয়োরাণী গল্পকে দৃষ্টি কটু ভাবে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নিজের মালিন্য ও দৈন্যকে ঢেকে রাখতে হচ্ছে। কাছাড়ে সাহিত্যিক মানেই কবি; গল্পকারদের সংখ্যা প্রকৃত অর্থেই অঙ্গুলিমেয়। পত্রিকা নির্ভর কাছাড়ের সাহিত্যে সিংহভাগ দখল করছে কবিতা।" (বাংলা গল্পে কাছাড়, তপোধীর ভট্টাচার্য, ঝঙ্কার, ১৯৭৩-৭৪)

'ফুলমালার সংসার' গল্পে লেখক একটি পরিবারের চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ফুলমালা একটি নারী চরিত্র তার বিয়ে হয় দোজবর প্রাণগোপালের সঙ্গে। তবে তাদের সংসার সুখেরই ছিল। তাদের সংসারে দুটি ছেলে হয়, তাদের নাম রেখেছিল নিতু ও নিমু। দেশে তখন দাঙ্গা হাঙ্গামা তাই দেশ ছেড়ে চলে আসতে হলো কলকাতায়। তবে নিতু, নিমু ও তার মা স্বামীকে নিয়ে সুখে ছিল। ফুলমালার ছোটো ছেলে নিমুর স্ত্রী কুন্তি শ্বাশুড়িকে মিথ্যা কথা বলে— ''মামাতো

বোনকে দেখতে আসবে, শ্যামনগর যাচ্ছে।"[১০] ছেলে ব্যাপারটা শুনেও শুধরানোর কোন ব্যবস্থা করেনি, বরং তার স্ত্রীকে আরও সায় দিয়ে ছিল। কিন্তু নিজ সন্তান ও পুত্রবধূ শ্বাশুড়িকে অবহেলা করছে। প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজের সন্তানদের মঙ্গল চায় তা তাদের ওই বোধটুকু নেই। ফুলমালার বড় ছেলে নিতু হারিয়ে গিয়েছিল, তার জন্য প্রাণগোপাল পোদ্দারের দুঃখ প্রকাশ করে না বলে মনে হয়েছিল ফুলমালার। তবে শিক্ষিত ছেলে নিমু তাদের কাছেই থাকে, দোকান চালায় রমরমিয়ে। নিমু বদলে যাচ্ছে সময়ের তালে তালে। এইসব দেখতে পেয়ে পিতা প্রাণগোপাল সহ্য করতে পারছে না। পিতার মনে সন্দেহের বাসা বাঁধে। তাই তার মনের দুঃখের তরঙ্গ বইছে। ছোট ছেলে নিমুকে বেশি ভালোবাসতে গিয়ে বড় ছেলে নিতুকে অবজ্ঞা করেছেন। পিতার কাছে সব ছেলেই সমান মর্যাদা পাবে। যখন বড় ছেলেকে হারিয়েছে তখনই তার আত্মসচেতন বোধ ধরা পড়েছে। নিতুর জন্য গোপাল পোদ্দারের দুঃখ হয়, কিন্তু ফুলমালার সামনে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে না। কারণ ফুলমালা তাকে এই অবহেলার জন্য সচেতন হতে বলেছিলেন। তাই আজ নিজে নিজেই লজ্জিত নিজের ভুলের জন্য। আজকে দেখতে পাচ্ছেন তার আদর করা ছোটো ছেলে পিতাকে কতটুকু বিশ্বাস করে। প্রাণগোপাল একদিন কেঁদে ছিল হাউ-হাউ করে, যে দিন খোলাদিন নিমু দোকান বন্ধ করে অথচ পিতাকে দোকানের চাবিটা দিয়ে যায়নি। চাবিটা না দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে পিতার প্রতি অবহেলা। এখন ছেলে নিজেই অর্থ উপার্জন করছে তাই তার অভিভাবকের দরকার নেই। এতে পিতার মনে আঘাত লাগে কারণ এখনো সংসারে সমস্ত দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দেয়নি। সংসার এই পরিস্থিতির মধ্যে হারানো ছেলের কথা বেশি করে মনে পড়ে পিতার।

প্রাণগোপাল পোদ্দারের টাকার নেশা পেয়ে গেল। তাই টাকার নেশায় পনেরো বছরের নিতুকে হকারির কাজে ঢুকিয়ে ছিল। সকাল বেলা দু'ঘন্টা

পরিশ্রম করলে ভালো অর্থ উপার্জন হয়। নিতুর কাগজ ফেরি করার কাজ ভালো লাগে না, তার মার কাছে জানায়। নিতু সব সময় সৎ পথে চলতে চায়, লোক ঠকানোর কাজ করতে নিতু অস্বীকার করলো। নিতুর বয়স যখন সতেরো বছর তখন যে পরামর্শ দিত মিথ্যা কথা না বলা, সিগারেট, গাঁজার নেশা না করা এই সব পরামর্শ শুনে বন্ধুরা রাগ করতো আবার বন্ধুর সঙ্গে তর্কও হতো। ভালো কথা, ভালো উপদেশ অনেকেরই ভালো লাগে না। একটি প্রবাদ আছে যে, 'উলু বনে মুক্ত ছড়ানো'। নিতু তাই এই কাজটি করেছেন। এই সৎ নিষ্ঠাবান ছেলেটি পিতা ও বন্ধুদের কাছে অবহেলিত হয়েছে।

এই গল্পে লেখক তুলে ধরেছে নিতুর স্বভাব চরিত্রের একটা উল্টো চরিত্র হল নিমুর চরিত্র। সে সব সময় মুখে মিষ্টি হাসি রাখে, কাউকে দুঃখ দেওয়ার মত কথা বলে না। সব কিছুর বিচার বিশ্লেষণ করে কথা বলে। নৈতিকথার দিক থেকে বিচার করে কথা বলে না কারণ তাতে অনেকের মতের বিরোধিতা ঘটে। এতে নিমুর তিক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নিমু দোকানটিতে নামী চা কোম্পানীকে দিয়ে রং করিয়ে নেয়। শ্যাম্পু, সাবানে ভরে দেয় শোকেজ। বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসা করতে জানে। দোকানের যে বোর্ডটি তার মায়ের নামে ছিল তা পাল্টে নিজের নামে করে নেয় অর্থাৎ নিমাই স্টোর্স। নিমু দোকানের চাবি পিতার হাতে দেন না আর সাইনবোর্ডে মায়ের নাম পরিবর্তন করেন— এতে অভিভাবকের যে দিন দিন মূল্যে কমে আসছে তাই ধরা পড়েছে। এখন আর পিতা ও মাতার পরিচয়ের দরকার নেই। এখন অভিভাবক নিমুর চোখে আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে। নিতু দাদা হিসাবে ছোট ভাইকে পড়াশোনা করাতে চেয়েছিলো। নিমু দাদা নিতুকে হাবা গোবা বলতেও ছাড়েনি। নিমু নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবতো। ফুলমালা তার পুত্রবধূ কুন্তিকে যথেষ্ট আদর করেন। তার ভাবনায় দেখা যায়— ''বাচ্চা মেয়ে কষ্ট হবে বলে কোন কাজ করতে দেয়নি। চুল বেঁধে দিয়েছে, চা করে

খাইয়েছে। রান্না করে ঢুকতে দেয়নি আদরের পুত্রবধূকে। বাইশ বছরের ছেলের কত বড় বৌ হবে! সতেরো বছরের কচি মেয়েকে এনেছিল মনের মতো সাজাবে বলে।"[১১] নিতুকে মাকড়সা, বাদর নামে ডাকতো প্রাণগোপাল। এভাবে ছেলেকে ডাকলে লজ্জায় ফেলা হয়। তাতে ছেলের কাজের বা চিন্তা-ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটতো। পিতার কাছে কোনো সন্তানই এই রকম ডাক শুনতে রাজি নয়। এতে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা অনেকটা কমে আসবে। পিতার মুখে এই শব্দগুলি শোনাবে অনেক নিচুমানের। ছেলের মনে ধরা পড়বে পিতা হিসাবে তাকে অবহেলা করছে। তাতে পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা অনেক দূরে সরে যাবে। এই অনুভূতিটা প্রাণগোপালের ছিল না। তাই আজ এই অনুশোচনা। কিন্তু ফুলমালাও স্বামী প্রাণগোপালের মনে কোনো শান্তি নেই। তাই ফুলমালা স্বামীকে বলে— ''তোমরাও থাকবে না, ছেলে বৌ এর গঞ্জনা থাকবে না, ছেলে দোকানের নাম পাল্টে কষ্টে ফেলবে না। মদের বোতল বিক্রি করার দুঃখ সইতে হবে না। মনের কষ্টে নেশা করতে হবে না।"[১১.ক] লেখক এই গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। একটি পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তাও দেখিয়েছেন। পরিবারে অর্থের বিনিময়ে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

ছোট গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ বাস্তব জীবনের উপর নির্ভর করে গল্প রচনা করেছেন। মানব জীবনের নানা বিধ সমস্যাগুলিকে শিল্পীর তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। নানা সমস্যাগুলিকে ধীরে ধীরে ছোটগল্পের মধ্যে প্রদান করেছে। রণবীর পুরকায়স্থ ছিলেন আপন মহিমায় ভাস্কর তাই তার গল্পের আঙ্গিক ও রীতির এক স্বতন্ত্র দিক লাভ করেছে। তার গল্পে বিভিন্ন জন-জাতির সমস্যাগুলো একেবারে মাটির কাছ থেকে তুলে ধরেছেন। আর চাকরী সূত্রে বিভিন্ন স্থানে বদলি হয়েছেন, আর এই জন্যেই তার গল্পে তথ্যবহুল সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। আর এই তথ্যগুলোকে ঘিরেই তার গল্পের কাহিনি গর্ভে উঠেছে।

রণবীর পুরকায়স্থের 'আসমান জমিন কথা' গল্পে দেখতে পাই সপ্তাশ্ব ব্যক্তিটি ছিল এক গতির বাহন, কখন কমায় কখন বাড়ায়। এই বিশ্বের সৌন্দর্যের দিকে তাকায় ও ভাবের অনুভূতি জাগায়। বরাক উপত্যকায় দরগাকোনার টিলার উপরে উঠে সে ভুলেই যায় তার গতি বাড়াতে। আবার এও ভাবে সুন্দরকে ধরতে হলে গতির কৃত্রিমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাই দৃশ্যমান সুন্দরকে আর মনের কুর্নিস জানিয়ে আর মনের মধ্যে সুর তোলে। সে এক বাউলের কবির গান গায়— ''মন আঁখি হতে পয়দা আসমান জমিন'' দরগাকোনার টিলা পাহাড়ের দুই বসতকার, তাদের ডাক নাম দুখু ও সুখু। এরা দুইজন ভাইবোন। এরা হলো চা শ্রমিক। দুখুর আসল নাম দক্ষিণারঞ্জন কুর্মি। এই নামকরণ করেছিল সপ্তাশ্বরের ঠাকুরদাদা অশ্বিনী কবিরাজ। সপ্তাশ্বরের বাল্যবন্ধু হল দুখু। দুখুর পিতার নাম লখিন্দর কুর্মি। লখিন্দর কুর্মির ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তাই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ খালি হাতে নেওয়া যায় না, জেনে এক টাকা চার আনা দিয়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানায়। তখন অশ্বিনী কবিরাজকে বলে ''দূর বে, তর লগে নি দক্ষিণার সম্পর্ক। তর পুয়া অইছে, অউ আমরার আনন্দ। তর জেঠিমার দেখিছ কততা লই আইবা। নতুন কাথা জামা, জুতা বউত্তা, আর আমি এক বকা বামন দেখো খালি হাতে আইছি। নে একটা দিয়া যাই। তরপুয়ার নাম রাখিছ দক্ষিণা, দক্ষিণারঞ্জন কুর্মি।''[১২] অশ্বিনী কবিরাজ ও লখিন্দর কুর্মির পরিবারের মধ্যে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল। তাই তাদের হাত থেকে কোন দক্ষিণা নিতে পারে না তার হৃদয়ে বাজে। কবিরাজের রোজগারের ব্যবস্থা ছিল পুরোহিত গিরি তা সত্যেও তার স্ত্রী লখিন্দরের ছেলের জন্য জামা ও কাথা দেওয়ার কথা শুনা যায়। লখিন্দরের মেয়ের নামও রেখে দেয় কবিরাজ।

অশ্বিনী কবিরাজের নাতি সপ্তাশ্ব, দুখু ও শাখী বড়জালেঙ্গা হাইস্কুলে পড়াশুনা করে। তবে দুখু বারবার ফেল করায় স্কুল পড়া ছেড়ে দেয়। আর অন্য

দিকে তার পিতা মারা যাওয়ায় সংসারও অচল হয়। কিন্তু বোন শাখীর পড়া চলতে থাকে। দুখু এখন ঘুগনি রুটির দোকান চালায়। সে বোনকে খুব ভালোবাসে। শাখী এখন জি.সি কলেজের একজন ছাত্রী। সপ্তাশ্ব কলেজে শাখীকে এক বছর মাত্র পায়। তখন তাদের যৌবন বয়স। তখন একে অপরকে ভালোবাসে সপ্তাশ্ব তখন শিলচর শহরের সান্নিধ্য টিকরবস্তির বাসিন্দা। সে শাখীকে নিয়ে অনেক কল্পনা করেছে এবং শাখীর উপর তার প্রবল আকর্ষণ ছিল। দুখু বিয়ে করেছিল মঙ্গলাকে, সে একদিন তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুখুর মানসিক অবস্থা ভালো ছিল না। দুখুকে বোঝানোর জন্য সপ্তাশ্বকে বলে— ''দেখবায় নে কুন্ দিন বাদশা বাবার গাছো ঝুলি যাইব তুমার বন্ধু। তুমি বুঝাইলে বুঝব, যাও না কেন?"[১৩] সপ্তাশ্বরের স্ত্রী রমা। শাখীর অভিমান আছে রমার প্রতি। কিন্তু শাখী জানে রমার কাছে সে কিছু না। রমা শিক্ষিতা এও জানে যে— ''বন্যেরা বনে সুন্দর"[১২] তাই অভিমানে রমা কোন দিন ধোয়ারবন্দ দিয়ে হাইলাকান্দি যায়নি। তাই রমাকে শাখী বার্তা পাঠায়— ''একবার আয়না বে বউ শ্বশুড়বাড়ী দরগাকোনাত, আদর যত্ন কারে কয় দেখাই দিব নে শাখী কুর্মি এ। জানি বেটি তুই আইতায় নায়। আমাকে তুমি ডরাও।"[১৪]

দুখু ও শাখীদের সমাজের চিত্র ফুটেছে। দুখু বিয়ে করে পালিয়েছে অন্য লোকের স্ত্রী মঙ্গলাকে নিয়ে। সপ্তাশ্ব ও শাখী কিন্তু এতে সমর্থন করেন নি। শাখীদের সমাজে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পরের স্ত্রী বিয়ে করা রীতি থাকলেও পূর্বতন স্বামীর আক্রমণের ভয়ও আছে। তবে যাই হোক দুখুর স্ত্রীর পূর্বতন শ্বশুড় বাড়ি থেকে কোন আঘাত না আশার আশঙ্কা দূর হয়েছে। মঙ্গলা ও দুখু দুজনেই এখন ঘুগনির দোকান চালায়। এখন দোকানের বিক্রিও বাড়ে। কিন্তু এই মঙ্গলা দুখুকেও ছেড়ে চলে যায়। ছোটো বোন শাখী অভিভাবকের মত দুখুকে বোঝায় পূর্বস্মৃতি ভুলে যাওয়ার জন্য। দুখুকেও এও আশ্বাস দেয় যে মঙ্গলা কারো স্থায়ী

হতে পারবে না। তাই শাখী দুখুকে বলে— ''তাই এক বেটার ঘর ভাঙ্গি আইছে, তর ভাঙ্গল, আবার ভাঙ্গব। তাই কুনু দিন কেউর অইত পারত নায়। ভুল যা ভাইয়া। তাহার খাতিন বহুত সুন্দর, আচ্ছা ভাবি আনব হাম।''[১৫] তাদের আশ্বাস পেয়ে সে সব দুঃখ ভুলে যাওয়ার কথা ভাবে।

শাখী বিটি পাশ করা মেয়ে। সে স্কুলে চাকরী করার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু তার কাছে দুই লক্ষ টাকা ঘুষ চায়। এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয় তার পরিবার থেকে। তার দাদার মাত্র একটি ঘুগনির দোকান। এই টাকা সপ্তাশ্ব দিতে চেয়ে দিতে পারেনি। বারবার তার অন্তর বাধা দিচ্ছে। তার ছেলের ভবিষ্যৎ আছে ভেবে। দুই সন্তানের পিতা অমরজিৎ নুনিয়ার সঙ্গে শাখীর বিয়ের আলাপ চলে। একথা শুনে সাখী কাঁদে। তার দাদার নিবুর্দ্ধিতার কথা সপ্তাশ্বকে জানায়। সে যদি বুদ্ধিমান হতো তাহলে তার স্ত্রী মঙ্গলা পালাতে পারতো না। শাখী আক্ষেপ করে সপ্তাশ্বকে বলে— ''আমার লাগি কেউর ভাবন লাগত নায়। আমি তুমরার বুঝা অই গেছি নানি?''[১৬] কিছুদিন পর শাখী মত স্থির করে অমরজিৎকে বিয়ে করবে। তখন সপ্তাশ্ব শুনে ঠিক থাকতে পারছে না। শাখী ছিল তার আকর্ষণীয় বস্তু। সে শাখীকে বিয়ে করতে বাধা দেয়। এই বাধা সে মানতে রাজি নয়। শাখীকে নানা প্রলোভন দেখায়, তাকে সম্পত্তি দেবে অর্ধেক আর কত কি। শাখী তাকে বলে— ''ই ক্ষমতা তোমার নাই লালাজি। কুলি বাড়ির কালা পুড়িয়ে বিয়া করার অইলে বহুত আগেউ করতায়।''[১৭] সপ্তাশ্ব জানায় রমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা, কিন্তু কিছু দিন পড় শাখীকে ছাড়তে আর হৃদয়ে বাধবে না। তাই শাখী অমরজিৎ এর স্ত্রী হয়ে থেকে যায়।

রণবীর পুরকায়স্থের ছোটো গল্পের প্রতিফলিত জীবনের যথাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ ফুটে ফঠেছে। তাই তার গল্পগুলি যতই পড়ি ততই ঋদ্ধ হই। এই জন্যই তার শিল্পী মাধ্যমের মৌলিক সর্বজনীনতা অনস্বীকার্য। প্রত্যেক জীবন

সন্ধানী লেখকেই স্বপ্নদর্শী। কিন্তু এই স্বপ্ন ব্যক্তিগত নয়, তা হয়ে উঠে সামূহিক স্মৃতি মন্থনের ফসল। এই স্মৃতি মন্থনের ফসল ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের গভীর মেল বন্ধন ভবিষ্যতের কাছেও চলে যায়। রণবীর পুরকায়স্থের 'আসমান জমিন কথা' গল্পে আঞ্চলিক ভাষা ফুটে উঠেছে। দুখু ও অশ্বিনী কবিরাজের আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন হল—

''কিতা বে, দক্ষিণা নি?

অয় জেঠামশায়।

তর পুয়ার নাম কিতা রাখচছ তে?

অখনও রাখছি না আইজ্ঞা, আপ্‌নে দিলাইন নাম।

আমি ত ভাবতেছিলাম দুখু, তার মারে বহুত দুখ দিচ্ছে আইজ্ঞা।

বালা অউত। দুখু রাখি দে ডাক নাম। ইস্কুলো উস্কুলো পরাইতে নানি। বালা নাম রাখি দে একটা। আপনে দিলাইন। তলব দিনে দিয়া আইমুনে আবার পাচ সিকা!''[১৮] কিন্তু এই ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিপুল ভৌগোলিক ও সামাজিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সংযোগ সামর্থ্যে কোন ঘাটতি নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেন লিখি' প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন— ''লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই সে সব কথা জানানো যায় না; সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই লিখি।'' তাই আমরা বলতে পারি রণবীর পুরকায়স্থ বরাক উপত্যকার বর্ণনা ও কলকাতার মহানাগরিক জীবনযাত্রার কথা ছোটো গল্পের মাধ্যমে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এক গল্পকার কীভাবে গল্প লিখবে তার স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। তাই তার গল্প লিখন আমাদের কাছে স্বতন্ত্রতা ধরে পড়ে। সপ্তাশ্বরের মনে রোমান্টিক ভাব ফুটে উঠেছে শাখীকে নিয়ে। তাকে ডাকে কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা। বর্ষার দিনে মনে

মনে গুন গুন করে গান করে— ''কালোমেয়ের কালো হরিণ চোখ''। তিনি শহরে গিয়ে সহজ সরল কথা পরিত্যাগ করে কথার চাতুরি শিখেছে। ''কথার আছে শতেক বাণী, যদি কথা কইতে জানি।''[২২] শাখী ছিল সপ্তাশ্বরের হাতের পুতুল, কাদার তাল, যাকে শৈশব থেকে নিজের মতো করে চালনা করে এসেছে, সে আজ অন্যের স্ত্রী হয়ে যাবে তা মেনে নিতে পারছেন না।

বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করলেও বিখ্যাত ছোটগল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ তার ছোটগল্পে নিয়ে এসেছে বিচিত্র ভাব-ভঙ্গিমা ও সুরের বর্ণনা। তিনি পূর্বে নির্ধারিত ছোটগল্পের কাঠামোকে ভেঙে নতুন মাত্রা দান করেছেন তার গল্পে সব সময়। তাঁর গল্পে ধরা পড়েছে সমাজ, দেশ, কাল, ব্যক্তি, অনুভূতির জগৎ। তাঁর গল্পে এত ফুটে উঠেছে আলো-আঁধারি রহস্যময়তা, যন্ত্রণা ও আনন্দ। ''আসমান জমিন কথা'' গল্পে সপ্তাশ্ব সিকিদার তার পুরোনো সব ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন সে শাখীর কাছে সব ভুলের ক্ষমা চেয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র সপ্তাশ্ব সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে অনেক নিচে নেমে এসেছে। শাখী দোজবর অমরজিতের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে সপ্তাশ্বরের স্ত্রী ও ছেলে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেছিল। তার চরিত্রে লোলুপতা ধরা পড়ে। শাখীকে এতদিন সে প্রেমিক হিসেবে দেখেছেন। তাই তাকে ভুলতে পারছেন না। তাই তার প্রতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তিনি ছিলেন আধুনিক শিক্ষিত যুবক ও নতুন জাগ্রত মানসিকতায় পরিপূর্ণ। এর ফলেই দেখা যায় তার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভাবনা-চিন্তার শেষ নেই। এই সব ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। আবার এই গল্পে রয়েছে সংসারের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা।

১৯৭৩-র জুলাইয়ে জন্ম নিয়েছিল 'শতক্রতু' পত্রিকা, এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অনেক ছোটগল্প। তাই বরাক উপত্যকার গল্প সংকলনের জন্য অপেক্ষা করতে হলো একুশ শতক পর্যন্ত, এটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। রণবীর পুরকায়স্থের

‘বোকা কাশীরাম কথা’ (২০০১) প্রকাশ করেছে আগরতলার অক্ষর প্রকাশনী, শেখর দাশের ‘কোষাগার’ (২০০০) এর প্রকাশ মেদিনীপুরের অমৃতলোক এবং মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ‘কক্ষপদ’ (২০০৩) প্রকাশ করেছে হাইলাকান্দির সাহিত্য পত্রিকায়। শেখর দাশ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য ও রণবীর পুরকায়স্থের এক সাথে যাত্রা শুরু করলেও তিন জনই ভিন্নপথগামী হয়ে পড়েছেন। মিথিলেশ ভট্টাচার্য শেখর দাশের মতো আগাগোড়া রয়ে গেছেন বরাক উপত্যকায়, কিন্তু রণবীর পুরকায়স্থ জীবিকার প্রয়োজনে ছিটকে গেছেন বাইরে। চাকরি সূত্রে তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, মণিপুর এবং এখন রয়েছেন কলকাতা মহানগরে। তিনি বাল্য জীবন ও কৈশোর জীবনে বরাক উপত্যকায় কাটালেও চাকরি সূত্রে অনেকগুলি শহরে বহুদিন কাটিয়েছেন। তাই তার অনেকগুলি— গল্প নগরকেন্দ্রিক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। নগরকেন্দ্রিক গল্পগুলি হলো— ‘সাদা-সিধে’, ‘স্বপ্নের ঝুমুর ঝামুর’, ‘লোকটাও টাকলু’, ‘রহস্য সন্দর্ভ’, ‘ওদের কথা’, ‘তরমুজ’ ইত্যাদি। অবশ্য তিনি সব সময়েই শিকড়ে জলের ঘ্রান খোঁজেন। তিনি সব সময় আপন গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সব কিছু দেখার বা খোঁজার চেষ্টা করতেন। রণবীর পুরকায়স্থ ক্রমাগত এক বয়ান থেকে সরে যাচ্ছেন অন্য বয়ানের দিকে। গল্পের ভাষা, গল্পবীক্ষায় কখনো কোনো একটি নির্দিষ্ট আকল্প অনুসরণ করতে চাননি।

রণবীর পুরকায়স্থের ‘ওদের কথা’ ছোটগল্পটি উত্তমপুরুষের লেখা। গল্প কথকের প্রিয় বন্ধু ছিল সুহাস চৌধুরী। কথকের ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বৌদিকে বৌঠান ডাকার। সে সুহাস চৌধুরীর স্ত্রী মিত্রাকে বৌঠান ডাকবে। বন্ধু সুহাস সঙ্গীত প্রিয়, তার গানে ছিল প্রবল উন্মাদনা। শিলচর শহরের অন্যতম শিল্পী সুহাস। তার গানের প্রশংসা করেন। দুই বন্ধু মিলে একই সঙ্গে ইন্টারভিউ দিলেও সুহাসের চাকরি হয়ে যায় হাতিছড়ায়। সে শিলচর শহর ছেড়ে চলে আসে হাতিছড়া শাখার থার্ড অফিসার গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। হাতিছড়ায় তার স্ত্রীকেও সঙ্গে

নিয়ে আসে। পরে কথকও চলে আসে হাতিছড়ায় তৃতীয় অফিসার হয়ে। কথকের প্রেমিক রিনা মন স্থির করতে না পারায় তাদের আর বিয়ে করা হলো না। কিন্তু তার কাজ করে দেওয়ার জন্য লোক নিয়োগ হয় যুবক মঙ্গালাল। সে পুকুর ছেঁচে মাগুর মাছ নিয়ে আসে, তাছাড়া আনে কাঁচা কলার কাঁদি। আনন্দে সে বলে উঠে— ''হামি পাকাবে কিন্তুক বাবু।'' তাকে কোন চাপ দিতে হয় না, সে দায়িত্ব সহকারে কথকের সেবা যত্ন করে। রান্না করতে মশলা পাতি বাটার দরকার তার জন্য চাই শিলনোড়া। শিলনোড়া না থাকায় মঙ্গাকে উৎসাহ দিয়ে কথন বলে— 'ডোন্ট ওয়ারি মঙ্গাবাবু, আজ সব ছিড়িয়া হোই।'— সব মশলা ছিড়ে ছিড়ে দেওয়ার কথা বলেন। এই খুশিতে মঙ্গা শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা ছেড়ার কথা ভাবার পরেই চিন্তা হয়। মঙ্গা বলে— ''মরিচ অউবা ছিড়িয়া উবা দিলাম অউবা তেজপাতা উবা ছিড়িয়া উবা দিলাম অউবা। হলদিউবা ছিড়িয়াউবা কেমনে উবা দিমুউবা?''[১৯] মঙ্গালাল ছিল চা শ্রমিক তাই জানা ছিল না। আর কথক ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ তাই তাকে বোঝাচ্ছে। মঙ্গালালের রান্নায় কথকের অরুচি হল ও বাধ্য হয়ে খায়। তাই বৌঠানকে বলেছেন মঙ্গাকে রান্না শেখাতে তখন বৌঠান মজা করে বিয়ে করে নিতে বলে। তখন কথক উত্তর দেয়— ''হবে হবে সব হবে। সমাজ একটু নড়ে চড়ে বসুক। কায়স্থ বাড়িতে ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ের স্বীকৃতি আসুক।''[২০] সমাজের এখনও দেখা যায় উচু জাত বা নীচু জাতের প্রচলন আছে। রিনা ব্রাহ্মণ কন্যা হওয়ায় তাকে বিবাহ করতে গিয়ে সামাজিক নানা বাধা দেখা দিয়েছে।

কথকের চাকরির সূত্রে নানা জায়গায় বদলি হয়েছে এবং নানা পরিবেশ সম্পর্কে জেনেছে। কথকের জংলী জয়াকে কোয়ার্টারে আশ্রয় দেন এবং তার কাজ করে দেয়। কিন্তু বৌঠান তাতে রাগ করেনি। রিনা কিন্তু বৌঠান ও জয়ার প্রতি রেগে আছে। রিনা বলে— ''জয়ার আর বৌঠান, তোমার আদরের নাম

দুটোকে খুন করে তবে ঘর শুরু করব। আমাকে কিন্তু প্লিজ, ন্যাকামির কোনও নাম দেবে না বলে রাখছি। আমি রিনা, রিনাই।"[২১] কোনো নারী চায়না তার প্রেমিক অন্য মহিলার সাথে মেলামেশা করুক। নিজের অধিকার অন্যের কাছে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। কথক বৌঠান ও জয়ার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠার কথা রিনার কাছে অকপটে বলে দেয় সময়ের উপর দোষ চাপিয়ে। কথক বলে— "সময়কে তো মানতে হবে। তখন ছিল এক রকম। তখন তুমি ছিলে না।"[২২] তার জবাবে প্রত্যাখ্যান করে বলে "সময় কিছু নয়। মনটাই রাজা। মন দিলেই সময়, নইলে কিছুই নয়।"[২৩] রিনা যথেষ্ট বিশুদ্ধবাদী প্রেম ও নারী পুরুষ সম্পর্কে। তাই কথকের অন্য নারীদের প্রতি আগ্রহ দেখালেই সন্দেহ ও মানসিক চাপের চাড়া দেয়।

এই গল্পে উচু নিচু বংশের ভেদাভেদ ভেঙে রিনা ও কথকের বিয়ে হয়েছিল। এখানে নারী ও পুরুষের ভালোবাসাকে জয়ী করেছেন লেখক। রিনার স্বামী হওয়ায় বৌঠান ও জয়াকে নিয়ে আলাদা ভাবে থাকতে পারেনি, কারণ সমাজ এটা মেনে নেয়নি। কথকের সমাজ ও জংলী মঙ্গালাল ও জয়াদের সমাজ আলাদা। জয়া এখন মঙ্গালালকে ছেড়ে চলে গেছে পাতিছারা বুধিয়ার সঙ্গে। জয়ার একথা শুনে কথকের অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। এই কথাটি বৌঠানও বলে দেয় ওদের সমাজে হয়। কথক বলে— "আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে হয় না?" কথকের ইচ্ছা সমাজের গণ্ডির মধ্যেই বাঁধা রইল।

সাহিত্য হল এক ধরনের বাচনিক শিল্প সাহিত্যের আধার হল ভাষা। একজন শিল্পী মূর্তি গড়েন। সেই মূর্তির উপাদান কি হবে তা নির্দেশ করেন শিল্পী। শিল্পী মূর্তি গড়তে গিয়ে উপাদান বদল করতেই পারেন। তার ইচ্ছে— ব্রোঞ্জ কিংবা মাটি দিয়ে অথবা প্লাস্টিকের সাহায্যে গড়তে পারেন। সাহিত্যমূর্তি গড়তে হয় কেবলমাত্র ভাষা দিয়ে। সাহিত্যের বয়ানে থাকে চরিত্র, প্লট বা কাহিনি

এইগুলি স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে তৈরি। কিন্তু তারা আদৌ আলাদা নয়। কারণ যে ভাষায় সাহিত্যিক লেখেন, সে ভাষায় বিন্যাসে বাঁধা থাকে রচনার অপরিহার্য উপাদান। লেখক তার সময়-কাল ও সমাজকে আবিষ্কার করতে চান রচনার ভাষা ও তার বুনোট দিয়ে। প্রথাগত ভাবে দেখা যায় লেখক হল ঈশ্বর, পাঠক হল ভক্তকূল এবং সমালোচক হল পুরোহিত। এই পুরোহিতের মতোই ঈশ্বরের বাণী সম্বলিত রচনা বোধ্য করে তোলেন পাঠকের কাছে। রলাঁ বার্তের মন্তব্যেও এরই প্রতিধ্বনি— "The author is a God (his place of rigin is the signified); as for the critic, he is the priest whose task is to decipher the writing of the God. (1974 : 174)। লেখকের রচনা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে প্রয়োগরীতির অভিনবত্বে। এই কারণে একই সময়ে লেখকের রচনা অন্য লেখকের রচনা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। তাই দেখা যায় লেখকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে লেখকের রচনার প্রতিটি স্তরে স্বাতন্ত্র সঞ্চারিত হয়।

সাহিত্য লেখা হলে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলক। হাতের লেখায় যেমন প্রতি মানুষের স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়, তেমনি সাহিত্য কৃতিত্বের ক্ষেত্রেও তেমনি স্বাতন্ত্রতা ধরা পড়ে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য পাঠ করলে বাঙালি বোদ্ধাপাঠক মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারেন লেখাটির রচয়িতা কার হতে পারে। অনেক সময় যদি কেউ কারো লেখা অনুসরণ করেন তাও বোঝা যায়। তাই রণবীর পুরকায়স্থের গল্প পাঠ করলে বোঝা যায় তার নিত্য নতুন কৌশল। এই কৌশল অন্যান্য লেখক থেকে তিনি একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি গল্পের মধ্যে 'বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ, পদ গঠন বা পদান্বয় ব্যবহারের প্রবণতা, আলঙ্কারিক উদ্দেশ্য' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা লক্ষণ থেকে আমরা রণবীর পুরকায়স্থের লেখা চিনে নিতে পারি। লেখক রণবীর পুরকায়স্থ নিজের লেখার স্টাইল সময়ের সঙ্গে

বদলে ফেলেছেন। তাঁর প্রথম গল্প সংকলনের থেকে পরিবর্তিত গল্প লেখার ধরন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

'বাজার' গল্পটি 'পূর্বদেশ গল্পপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'শিকড়ের সন্ধানে' গল্প সংকলনের 'বাজার' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়। হাইলাকান্দি বাজারের একমাত্র রবিবারের বাজার হল করমুজকান্দি বাজার। এই বাজারের পাশে যে সব চা বাগান রয়েছে, সেই বাগানে শনিবার হল হপ্তা অর্থাৎ তাদের তলবদিন। তলবদিনে হাড়িয়া মাড়িয়া খেয়ে যা বাঁছে তা নিয়ে আসে রবিবার করমুজকান্দি বাজারে। বাজারে চা শ্রমিকেরা কিছু জিনিস কেনে এবং বাজারে তারা আসে আনন্দ উপভোগ করার জন্য। যাদের হাতে টাকা নেই তাদেরকে মহাজন বুঝে শুনে বাকিও দেন।

একটি সাইকেল চুরি যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাজন এসেছিল করমুজকান্দি বাজারে। সেখানে এসে নেপাল মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করে মাছের বাজার বসে কিনা! তখন নেপাল মাস্টার জ্ঞাননিষ্ঠের মতো জানায়, ''না স্যার, মাছ ইখানো কে কিনত, সব তো বাগানর কুলি আর গাউর লেংটা লুংটা মানুষ। অই জলাত করি ইচা পুটি মকার ভাগা লইয়া বই রইছে দুই একজন। বাজার তো হইল হউ। আপনারা যার টানে আইন।''[২৪]

মহাজন বাজারে ছাগল কিনতে গিয়ে তার পরিচিত বন্ধু রূপাই মিয়ার সঙ্গে দেখা এবং ব্যাঙ্কঋণীর সঙ্গেও দেখা হয়। পাঠা কেনার সময় তার পুলিশকর্মী এ.এস.আই. চক্রধর দাশ পাঠাওয়ালাকে ধমকায়। এ.এস.আই. চক্রধর দাশ বলে— ''নতুন মানুষ পাইয়া খুব ঠগাইলে বেটা। পাঠা ছাগল বেচার লাইসেন আছে নি তোর, দেখা।''[২৫]

মহাজন সুবুদের চায়ের দোকানে সাইকেল রেখে এসেছিল। তা পেয়েছিল

তার বাড়ির কর্মচারী কালা। অথচ পুলিশ বাহিনী কালাকেই দোষি বানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ কালাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ.এস.আই. চক্রধর আদালতে তাকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করলেন না। 'বাজার' গল্পটিতে করমুজকান্দি রবিবারের বাজারের বৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনি প্রশাসনিক কর্মীদের নিষ্ঠুর আচরণের দিকটিও তুলে ধরেছেন লেখক। এই গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে চা বাগানের শ্রমিকের জীবন যাত্রার ছবি। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকের জীবনযাত্রা ছিল অনেকটা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও পদদলিত। সমাজ তাদের কাছে মনে হতো একটা কারাগার। এই সমাজে একের পর এক প্রতারিত হতো। চা শ্রমিকরা এক মুঠো ভাতের জন্য অনেক পরিশ্রম করতো। সেই পরিশ্রমের মূল্য সমাজ তাদের দেয়নি। বলতে গেলে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মালিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন দালাল চক্রের মাধ্যমে তারা প্রতারিত হচ্ছে। ইংরেজরা দালালের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুরুষ মহিলাকে চা বাগানে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করেছিল। পুরুষ মহিলা তো ছিলই সেই সঙ্গে শিশুদেরকেও চা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। চা শ্রমিকদের শোষণ ও শাসন করেছিল এবং তাদের চিন্তা চেতনাকে ধ্বংস করেছিল।

'বাজার' গল্পটির মধ্যে করমুজকান্দি বাজার হল রবিবারের বাজার। সপ্তাহে একদিন বসে এই বাজার। এই বাজারে বিক্রি হয় আঁটি বাঁধা লাইশাক, ধনিয়াপাতা, আলুপাতা, পালই শাক, হেলাইঞ্চার আঁটি, ভাগা ঠুনমানকুনি ইত্যাদি। বাজারে পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হত। নিত্য নতুন জিনিস কেনা হয় ও বিক্রি হয়। বাজারে শুধু কেনা বেচা নয়, বাজারে এসে আনন্দে বেড়ানো যায়। এই করমুজকান্দি বাজার হল চারপাশের মানুষের আনন্দের স্থল। আমরা প্রত্যেকে জানি বাজারে যাওয়া মানে এক নতুন পরিবেশ নিজেকে যুক্ত করে মনে আনন্দ নেওয়া। তাই লেখক দেখিয়েছে—

‘‘আলগাপুর, সরসপুর, মোহনপুর, কুচিলা এমনকি বাঘবাহার, আইরংমারা থেকেও দল বেঁধে মানুষ বাজার-বাহার দেখতে আসে। দলে দলে রঙ বেরঙের সোয়েটার চাদর জড়ানো মানুষজন। এরা সবাই ক্রেতা নয়, শীতকালের মর্ণিং রাইডার। এদিকের লাল রাজেশ্বরপুর ওদিকের হাইলাকান্দির মধ্যবিত্তরা দুরকম বাসে, অটো, স্কুটার, বন্ধুর বাইকে, উচ্চবিত্তরা নিজের গাড়িতে, গাড়িওলা চাকুরেরা অফিসের গাড়িতে।’’[২৬]

চা বাগানের শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম ও অভাব থেকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকার জন্য মদ্য পান করে। তাতে কিছু অর্থ ব্যয় হয় যা বাকি থাকে তা দিয়ে বাজার করে।

অন্যদিকে দেখা যায় ভন্ড প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আইনের পুলিশকর্মীরা নিজেদের স্বার্থে আইনকে ব্যবহার করছে। মানুষকে নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে শোষণ করছে। নিরপরাধকে ধরে শাস্তি দিচ্ছে। তাদের কাছে আইন বলে কিছু নেই। অথচ এই সব লোক শাসন বিভাগে কাজ করছে। নিজেরাই অন্যায় করছে অথচ তারা অপরাধীকে কি ভাবে ধরবে এই প্রশ্ন উঠে আসে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই ধারণা তুলে ধরেছেন। আজকাল স্বচ্ছ বিচার পায় না সাধারণ মানুষ। মহাজন একটি সাইকেল হারানোর ব্যাপার নিয়ে পুলিশকর্মী যে ভাবে তল্লাসি শুরু করেছেন তা যেন ‘মশা মাড়তে কামান দাগা’।

রণবীর পুরকায়স্থের রচিত ‘যাহা যায়’ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ‘এবং মুশায়েরা’ পত্রিকায়। পরে এই গল্পটি ‘শিকড়ের সন্ধানে’ গল্প সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্প সংকলনের ষষ্ঠ নং গল্প হল ‘যাহা যায়’। এই গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র অচলবিহারী সোম। তিনি নিজের স্বদেশের ঘ্রান নিতে গিয়েছিল শিলচর। বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেসে চরে

যখন লোয়ার হাফলং-এ আসেন তখন আর পুরোনো স্মৃতির সঙ্গে মেলাতে পারছেন না। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে সবকিছুই। তাই সে ভাবছে— ''সময় ফেরাতে মনের ভিতর উথাল পাথাল যেমন চাই, পারিপার্শ্বিকেও চাই প্রত্ন ছাপ।''[২৭] ভাঙা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'রবি ঘোষ কন্ট্রাক্টর' সেটি আজ আর সেখানে নেই। সব কিছুই উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। পাহাড় লাইনের প্ল্যাটফর্মের পাশেই আছে আগের মত পান সিগারেটের দোকানগুলি।

শিল্পী অচলবিহারী ফেলে আসা শিলচর দেখার জন্যই বাড়ি থেকে বেড়িয়েছেন। তিনি ফেলে আসা সময়কে খুঁজতে বেড়িয়েছেন। শিল্পী অচলবিহারী সোম ঘড়ির চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং বরাক উপত্যকার নিসর্গ ছবিও একেছেন যার মধ্যে দিয়ে তিনি কৈশোরের স্বাদ অনুভব করতেন। ছবির মধ্যে দিয়ে নিজের স্বদেশকে দেখতেন। তার মাতৃভূমি বরাক উপত্যকা, তার ঘ্রান নিতেই আজ বেড়িয়েছেন বাড়ি থেকে। অচলবিহারীর মাতৃভাষা সিলেটি কথা বলে মনের সুখে আর পুরোনো বন্ধু মনে মনে খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন চল্লিশ বছরের এক পুরোনো বন্ধু ষষ্ঠীব্রতকে। অচলবিহারী পুরোনো বন্ধুর নাম শুনেই মনে উথাল পাথাল করে উঠে। ষষ্ঠীব্রত তাকে দেখে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি দেখে পুরোনো সব স্মৃতি ধরিয়ে দিচ্ছে যাতে তাকে চিনতে পারে। ষষ্ঠীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। অচলবিহারী ষষ্ঠীকে বলে— ''— তুই বোধ হয় এখনও আমাকে চিনতে পারিস নি। বিশ্বাস করবি না প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে হাঁটতে তোর কথাই মনে হচ্ছিল। নাম মনে করতে পারছিলাম না।''[২৮] ষষ্ঠীব্রত এখন বিয়ের ঘটকালি করে অর্থ উপার্জন করে। অচলবিহারীর মেয়ে রঙ্গিলী বরাক উপত্যকায় ঘুরতে না আসায় মনে মনে অভিমান করেছে। মালুগ্রামের যে বাড়িটা বাগানে ঘেরা রয়েছে তাও দেখতে পেলো না। ট্রেনে চড়ে বরাক উপত্যকায় গেলে যে সব স্টেশনের নাম পাওয়া যাবে সেই সুন্দর নাম ভারতে আর কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না।

তাই তিনি সেই স্টেশনের নামগুলি বলেন— ''ডিটকছড়া, দাউতুহাজা, মাইবং, মাহুর, হাফলং, জাটিংগা, হারাঙ্গাজাও নামের বর্ণালীতে কোন রঙটা নেই?''[২৯] অচলবিহারী সোম বন্ধু ষষ্ঠীব্রত চক্রবর্তীতে বলে সেও ঘটকালি করে।

মেয়ে রঙ্গিলী বাবার সম্পর্কে অনেক কথাই ভাবছে। শিলচরে আপন জন বলতে এখন আর কেউ নেই, যারা আছে তারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে না। তবে দু'এক দিনের জন্য ঘুরতে যাওয়া যায় এক মাস কি করে কাটাবে। ভোলা, গামারি, শিরিষ, ছাতনি গাছের বনে ঘুরে বেড়াবে আর কলাগাছ, বেতগাছ, বাঁশঝাড়ের গন্ধ শুঁকবে। একথা শুনে অচলবিহারী বলে— ''নারে এবার যাব গুপ্তধনের সন্ধানে। বাঁশের কুরুল খুঁজতে। টুকরি চাপা দিয়ে রেখে এসেছিলাম আমার শৈশব আর যৌবন। দেখি যদি বাঁশের করুল ফুঁড়ে ফুল বেরোয়। লাখ টাকার ছবি হবে তোর বাপের।''[৩০] মেয়ে সতর্ক করেছিল বৃদ্ধ রিক্সাওয়ালার রিক্সায় যেন না উঠে। তবুও সে উঠেছিল এবং মনে মনে তার পূর্বের স্মৃতি ভেসে উঠল। ভক্তির সঙ্গে রিক্সায় ঘুরে বেড়ানোর কথা এবং ছেলের দল তাকে আক্রমণ করেছিল তখন জগড়দেও তাকে রক্ষা করেছিল। জগড়দেও তার জন্য মার খেতে হয়েছিল। তিনি সবসময় ফিরে যাচ্ছেন ফেলে আসা সময়ের দিকে। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি স্ত্রীখেয়ালী ও মেয়ে রঙ্গিলী নিয়ে কলকাতা বাস করেন।

অচলবিহারী শিলচর ছেড়েছেন ত্রিশ বছর আগে। এই ফেলে আসা ত্রিশটি বছর কেউ ফেরাতে পারবে না। অচলবিহারী প্রাণের বন্ধু ছিল জগড়দেও। জগড়দেও তাকে বলছে চিনে না, তার নাম বলছে আলতামাস। এই নামে কোনো বন্ধু ছিল বলে মনে পড়ছে না। অতীতকে স্মরণ করতে করতে মনে পড়ে যায় মেয়ে রঙ্গিলীর কথা। ''শুধুই সন্তানের মুখ মনের উপর স্থির। স্টেশনের কাছে হোটেল আছে একটা। গাঙরু মিয়ার হোটেল। শুধু থাকার পপুলার হোটেল। ভোর হলেই বরাক ভ্যালি আবার। রঙ্গিলীকে ঢুকি দিয়ে ডাকবেন আর ছত্রিশখানা

টানেল পার হয়ে যাবে নিমেষে।"[৩১]

অচলবিহারী কৈশোর কালকে খুঁজতে বেড়িয়েছেন শিলচরে। শিলচরে এসে পুরোনো স্মৃতি আর খুঁজে পাচ্ছেন না। সময়ের তালে তালে অনেক কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে। একমাস থাকার হিসেব করে এসে এক রাত থেকেই ফিরে আসবেন। আসলে যাহা যায় তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। লেখক এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে আমাদের নতুন অনুভূতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সময় কারো জন্য বসে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রত্যেকটি বিষয়েই পরিবর্তন হয় যা পূর্বের সঙ্গে মেলে না। আর মেলানো সম্ভবও নয়। এই গল্পটি পড়লে বোঝা যায় কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। অচলবিহারী ভেবেছিল সব কিছুই আগের মতো আছে এখনও। এতে দুঃখ আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি পরিবর্তনটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কবি মণীন্দ্র রায় 'চিঠি' কবিতায় উল্লেখ করেছেন এক উদ্‌বাস্তু রমণীর স্বদেশ প্রেমের কথা। এই রমণী কবির বাড়িতে কাজের লোক বা পরিচারিকা। তাকে সরলার মা বলে ডাকা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পাবনায় বন্যায় খবর শুনে সরলার মা কাঁদতে শুরু করে অথচ তার তিন কূলে কেউ নেই, তবু তিনি নিজের দেশের বন্যার কথা শুনে ব্যথিত হয়েছেন, তার চোখে জল এসে যায়—

"কিন্তু নেই তিন কূলে কেউ,
সরলাও গেছে পরলোক,
তার মনে জাগল কার শোকে
দ্বিতীয় বন্যার এই ঢেউ?'

'যাহা যায়' গল্পে অচলবিহারী চরিত্রটি উদ্‌বাস্তু নয়। সে বরাক উপত্যকা ছেড়ে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় বাস করে। অথচ তার মন পরে আছে

বরাক উপত্যকায়। বরাক অঞ্চলের নিসর্গ প্রকৃতির দিকে। বরাক অঞ্চলের মানুষের প্রতি তার গভীর টান রয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর বরাক উপত্যকা ছেড়ে থাকলেও ভুলতে পারছেন না তার ফেলে আসা বরাক উপত্যকাকে। কাজের অবকাশে তিনি পূর্ব স্মৃতি চর্চা করেন।

'বাজিকর' গল্পটি 'শিকড়ের সন্ধানে' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গল্পটি প্রথম 'এবং এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে ঢেঁকি কুমার গণেশ ভাবে পাষণ্ড মামা শনৈশ্চরের মেয়ে চম্পার কথা। চম্পা এখন বৈজুনাথের স্ত্রী হতে চাইছে। গণেশ নিজের নামডাক শুনে গর্বিত। গণেশ এখনও চম্পারশরীর জলের ঘ্রানের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। গণেশ ভাবে কেন তাকে দেখতে আসে না মামাতো বোন চম্পা, হয়ত বৈজুনাথ আসতে বাধা দিয়েছে। বৈজুনাথকে গ্রামের মানুষ ভয় করে। অনেকে তাকে শ্রদ্ধা করে, যারা তার চামচা। সে গরিবের নেতা সেজে হিংস্র মনোভাব লুকিয়ে রাখে। বৈজুনাথের চরিত্রে লক্ষ করা যায়— ''বাপের পক্ষ্মাঘাতে পেছনে ও রয়েছে শয়তানি লোভ। বাপের ব্যবসা বন্ধ করতে সীমান্তে খুন করিয়েছে গজানন সাঁপুইকে। জগন্নাথ কামারের গাঁজা চালান বন্ধ হাপর ঘরকে করে দিয়েছে আশ্রম।''[৩২]

পটাস-ডাঙা-সোনাপুর গ্রামটি দশ বছরে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। শাক সব্জি, ধান উৎপাদনে এই আদর্শ গ্রামটি রেকর্ড করেছে এবং গ্রামে রায়ত, বর্গাদার, জমিদার, জোড়দার সকলেই শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করেছে।

বৈজুনাথ হল পঞ্চায়েত প্রধান। সে গ্রামের সমস্যা মিটিয়ে দেয়। গ্রামে সে সুকীর্তি লাভ করেছে বাবা প্রতাপচাঁদের সম্মান লঘু করে। তিনি চক্রান্ত করে গজানন সাঁপুইকে হত্যা করিয়েছেন এবং গাঁজা পাচারের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। গণেশ জাদুকরকে কুড়ি বছর পরে ফিরিয়ে আনে বৈজুনাথ। বৈজুনাথ তাকে

চিনতে পারেনি। গণেশ জাদুকর নানা উপায়ে ফটাসডাঙা সোনাপুর গ্রামের উত্থান পতনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। নিজেদের গ্রামের মানুষজন তাকে ভুলেই গেছে। বাজিকর অসাধ্য সাধন করলো জাদুবলে বৈজুনাথ আর ঢেঁকি গণেশকে ঢুকিয়ে দিল জগন্নাথ কামারের হাপর ঘরে। জগা কামারের হাপরঘরে ভূতনাথ থাকে। বৈজুনাথ জগা কাকার ভালো মন্দ খবর রাখে গ্রামের মানুষরা খুশি হয়।

প্রতাপ সরদারের ছেলে বৈজুনাথের উপর চটে আছেন কারণ শনৈশ্চরের মেয়ে চম্পাকে বিয়ে করবে বলে। তাই তাকে ত্যাজ্য পুত্র করতে চেয়েছে। মনের দুঃখে এই সব কথা তিনি জানান জগাকে। প্রতাপ সরদার নির্বাচনে দাঁড়ানোর সখ অনেক দিনের কিন্তু তার তিন দিকে শত্রু রয়েছে। এক তার নিজের ছেলে বৈজুনাথ, দুই শনৈশ্চর নির্বাচনে দাড়াচ্ছে, তিন ভূতনাথ বাজিকর।

বৈজুনাথ পরেছে দ্বিধা দ্বন্দ্বে, কারণ এক দিকে তার বাবা আর অপর দিকে তার হবু শ্বশুর। দুই সরদারের মধ্যে লড়াই। তাই ভূতনাথ বাজিকরের সাহায্য চাইছে বৈজুনাথ। এই সুযোগে ভূতনাথ বাজিকর বলে— ''বর্গাচাষীর জমি, রায়তের জমি, যা তোর বাপ ফাকা হড়প করেছে, ফিরিয়ে দিবি? দেবোত্তর বলে মিথ্যে নামজারি করল তোর বাপ, দিবি?''[৩৩] ভূতনাথ বৈজুকে বলে— ''নারে বেটা, মানুষের মন্দ করতে নেই।''[৩৪]

চম্পা আর বৈজুনাথ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার আগে হঠাৎ উধাও হওয়ার কথা গ্রামে ছড়িয়ে পরে। চম্পা ও বৈজুনাথকে হত্যা করেছে বাজিকর ভূতনাথ এই খবর রটে গ্রামে। ঢেঁকি গণেশ ও জগা কামার দুই জমিদারের শিবিরে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়। আক্রমণ হওয়ার আগেই ভূতনাথ সন্তান ফিরিয়ে দেন, আর জগন্নাথ কামার গান বেঁধে গ্রামবাসীকে নমস্কার করে,

''হরি হরি বল সবে জয় ভূতনাথ

সাধু সাধু করি সাঙ্গ হল খেলা।
নিজ নিজ ঘরে গিয়া করহ মেলা
আপন সন্তানের আর করিও না হেলা।”[৩৫]

সন্তানদেরকে নিয়ে অভিভাবকের এত ত্যাজ খাটে না। সন্তানদের চিন্তা চেতনাকেও বিচার করতে হয়। ভূতনাথের কৌশলে দুই পিতা এখন আনন্দে পাশাপাশি হয়েছে আগের মত বন্ধুত্ব হয়েছে।

অন্যদিকে ভূতনাথ বাজিকরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে জমিদার পুত্র বৈজুনাথের। জগন্নাথ কবিয়াল ও ঢেঁকিগণেশ অবাক হয় বৈজুনাথের চাতুরি দেখে। এখন আর বাজিকরের দরকার নেই বলে তাকে তিন দিনের দিন গ্রাম ছাড়তে হয়। এখন দুই বন্ধু— ‘লক্ষ্মীবারের পরের দিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুই আটচালা ঘরের বন্ধু এক সঙ্গে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে ফেরে যেদিন। প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহযোগী হিসেবে। তাড়া খাওয়া ব্যর্থ বাজিকরের সঙ্গে ঢেঁকির পাড় দিতে দিতে গণেশ কুমারও ধায়।”[৩৬]

রণবীর পুরকায়স্থের গল্প পড়লে দেখা যায় আঞ্চলিক উপভাষার প্রচলন। তাঁর রচনার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় স্থানিক বা সামাজিক শ্রেণি। ‘আসামন জমিন কথা’, ‘বাজার’, ‘ইচ্ছাকলি’, ‘কাঠের গিরগিটি’, ‘শিকড়ের সন্ধানে’, ‘যাহা যায়’, ‘অন্তর খোঁজে’, ‘আপদ্ধর্ম’ প্রভৃতি গল্পে আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ করেছে। এই উপভাষা প্রয়োগ করে নিজের স্থানিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আর অন্যদিকে সামাজিক শ্রেণি উপভাষার ব্যবহার করে লেখকের সামাজিক স্তর সম্পর্কে পাঠকদের ওয়াকিবহাল করেছেন।

‘অন্তর খোঁজে’ গল্পটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ‘সৃষ্টির একুশ শতক’ পত্রিকায় উলার চৌদ্দ বছর বয়স হলে পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে বরাক নদীতে স্নান

করতে যায়। বরাক নদী পার হয়ে কত বার দুধপাতিলের মাটি ছুয়েছে তার হিসেব রাখে। উলার সঙ্গী হল ভোলা ও লক্ষ্মীরানি। গোস্বামীদের বাড়িতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ কোনো কিছু ছুঁতে পারতো না। তাই উলা গোস্বামী লক্ষ্মীকে কুবুদ্ধি দিয়ে বলে— ''— সব ছুই দিছ, কিচ্ছু অইত নায়''।[৩৭] উলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদায়ের যে বিভেদ আছে তা ভাঙতে চেষ্টা করেছেন। কারণ একই রক্তমাংসের মানুষ আমরা অথচ গোস্বামীর বাড়ির কোন জিনিস ছোয়া যায় না এটা হতে পারে না। উলা গোস্বামী বাড়ির ছেলে হয়েও ছোঁয়া ছোয়িতে লক্ষ্মীকে বাধা দেয় না। উলা ভূগোল পরীক্ষায় শুধু পঞ্চাশের বেশি নম্বর পায়। কারণ বরাক নদীর প্রতি তার গভীর টান রয়েছে। সে ভূগোল পরীক্ষার খাতায় ''নদীর প্রাথমিক গতিতে রবিঠাকুরও ঢুকিয়ে দেয় 'থর থর কাঁপিছে ভূধর শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসি'।''[৩৮] উলার ছিলেন প্রকৃতি প্রেমি, মুক্ত মনের মানুষ।

মধুমঙ্গল যাদব বিহারি ছেলে, সে দুধ বিক্রি করে বাড়ি বাড়ি। অমূল্যের চা দোকানে চা খায়, বিড়ি পান করে এবং নিজেকে সর্বহারা বলে। অমূল্যর জলের ড্রাম থেকে জল সে দুধে ডালে। দোকানদার অমূল্য দেখে ফেললে সে বলে, ''— ক্যায়া করেগা বাবুয়া, গরিব আদমি হ্যায়, করনা পড়তা হ্যায়।''[৩৯] মধুমঙ্গল তার সত্যতা স্বীকার করেছে। উলার বন্ধু শুভদাপ্রসাদ জানায় দেশ ভাগের ফলে বাঙালিও দুভাগ হয়েছে। ধর্মের দিক থেকে দুটি ধর্ম হল হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ আছে, একটি ভাগ হল কড়া সনাতনপন্থী, গনগনে আঁচের চাটু, জলের ছিটে পড়লেই চড়চড়িয়ে ওঠে। আর একটি ভাগ হল মুক্তমনের মানুষ, ধর্মকে সব বিভেদের মূল ভেবেছে তারা হল বামপন্থী। আবার তৃতীয় আরেকটি ভাগও পাওয়া যায় মধ্যপন্থী। শুভদা প্রসাদ হল মধ্যপন্থী। অমূল্য চা দোকানে চায়ের টেবিল বাজিয়ে গান গায়—

''আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম

গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান খাঁটুগান গাইতাম।”

শুভপ্রসাদ ছেড়ে আসা নিজের স্বদেশের কথা বার বার মনে করেছেন। তাই তার অন্তর থেকে জেগে উঠেছে এই গান। এই গানের মধ্যে দিয়ে নিজের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। আর উলা গোস্বামী স্বাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করেছে, তাই তার কাছে ছেড়ে আসা দেশের স্মৃতি মনে কি ভাবে সাড়া জাগে তা অনুভব করতে পারে না। উলা ও শুভপ্রসাদ দুই বন্ধুর কথোপকথনে জানা যায়, উলা বলে— “— ও জবাকুসুম তেল নি? বুঝছি ইতা অখন ছাড়ি দিছি। সূর্য প্রণাম আর গীতা পাঠ বাদ। ইতায় কিছু অইত নায়। ভাবছি মধুদার লগে পার্টি করমু।”[৪০] উলা গোস্বামী ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হওয়া সত্যেও গীতা পাঠ বাদ দিয়েছি, পুরোহিত গিরি ছেড়েছে। এখন তিনি রাজনীতিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। কারণ রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে মিথ্যা প্রলোভন দেখানো হয়। এখন উলা এই রাজনীতির মিথ্যার খেলা খেলতে চলেছেন।

এই গল্পটিতে লেখক তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে প্রধান পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন— ‘ওজন আড়াই সের’। ‘ওজন আড়াই সের’ পরিচ্ছেদে উলা গোস্বামী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক ব্রাহ্মণদের জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন।

এই গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হল ‘এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ’। উলা বি.এ. পাশ করে চাকরি পেয়ে যান। চাকরির দ্বিতীয় দিনে উলার বাড়িতে পুলিশ আসে লাল রঙের বই খুঁজতে। তখন উলা চাকরি ছেড়ে বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেসে চড়ে চলে যায় গৌহাটিতে। গৌহাটিতে পল্টনবাজারের এজেন্সি হাউসে একশো দশ টাকা মূল্যে চাকরিও পেয়ে যায়। এক দিন বিকেলে বেলা হোটেলে

ফেরার সময় এক নতুন বন্ধু অমৃত চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়। উলা যে হিন্দু নিবাসে থাকে তার পাশে বেসরকারি ব্যাঙ্কের চাকরি করে অমৃত চক্রবর্তী। এই বন্ধু উলার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। অমৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিজ্ঞপ্তির ফর্ম এনে তাকে দিয়ে পূরণ করায় এবং উলার চাকরিও হয়ে যায় নীলকণ্ঠপুরে। সৎ বন্ধু অমৃত উলার ভালোর জন্য একাজ করেছে। কিন্তু উলা স্বার্থপরের মত তার কাছে দেখা করেনি বরং নিজে বিরক্ত বোধ করেছে। উলার দশ বছরের ছোট বোন শিবানীর বিয়ে ঠিক হয়েছে বনবিভাগের কর্মী তারাপদের সঙ্গে। অমৃত চক্রবর্তীর কাছে বিয়ের চিঠি পাঠায়। সে চিঠি ফিরে আসে কারণ অমৃত চক্রবর্তী পরলোক গমন করেছেন। উলার জন্য অমৃত এত কিছু করল অথচ সে মারা গেল তার খোজখবর পর্যন্ত রাখে না। উলাকে তার জ্যাঠা, জামাই বরাক উপত্যকায় চাকরি বদলি করে চলে আসতে বলে কিন্তু সে রাজি নয়। নিজের স্বদেশ বরাক উপত্যকাকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে রাখছে। অবশেষে বাধ্য হয়েই বরাক উপত্যকায় বদলি হয়ে আসে।

উলার বয়স যখন ছিল তেরো বছর তখন সে বুঝতে পারেনি ১৯৬১ সালে ১৯শে মে-র ভাষা আন্দোলন। পরে জানতে পেরেছে শুভপ্রসাদ কবির কাছে। এখন উলা জানে ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা। উলার ছেলের নাম ঋজু গোস্বামী। তার ডাক নাম রেখেছে কাঞ্চন। এই কাঞ্চন নামটি ছিল একজন বিপ্লবী কাঞ্জনের। সে সংগ্রামে আত্মত্যাগ করেছেন। তাই উলা চেয়েছে ঋজু যেন কাঞ্চনের মতই বিপ্লবী হন। উলার বয়স বাষট্টি বছর। তখন তার ছেলে ঋজু বাইক দুর্ঘটনায় মারা যায়। এতে উলার জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এজন্য পিতা হিসেবে এই দুর্ঘটনার মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি।

এই গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হল 'তোমরা একটু আস্তে কথা কও'। উলার ছোটো বোন শিবানীর ছেলে অন্তু। সে কলকাতা থাকে। অন্তুর মুখখানা যেন

উলার বাবার মুখের মতো। তাই উলা অন্তুতে অপত্য স্নেহে ভালোবাসে। পুনে বাইক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ায় ভাগ্নেকে উলা বলে— ''তুই যাইছ না কুনুখানো, শিলচর থাকি যা।''[৪২] অন্তু ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে। অন্তুর বাবা-মা মিলে এবার পাঠাবে কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার জন্যে। অন্তু তার বাবার ঘুষের টাকায় পড়াশুনা করতে চায় না। মামা উলাকে অন্তু বলে—

''— কিওর শাবাস? ইতা উইশফুল আনন্দ। করউকা তারা, তুমার ভইন ভইনর জানাইয়ে। এমনেউ চুপসি যাইব বেলুন। আমি যাইতাম নায় কুনুখানো। পড়তায় নায় কইছি না নি ঘুষর টেকায়?''[৪৩] অন্তু অসৎ উপায়ে রোজগার পছন্দ করে না।

ছয় মাস পরে অন্তুর বাবা তারাপদ চক্রবর্তী কলকাতার 'দৈনিক আজকাল' খবরের কাগজে দেখে অন্তুর ছবি। এই ছবি দেখে আতকে উঠে। তখন শিবানী দাদা উলাকে বলে—

''দাদা তুমি একবার যাও কইলকাতা। আমার অন্তুরে ফিরাই আনি দেও।''

কলকাতার বন্ধু মান্তুকে বলেছে তার মামা উলা গোস্বামীর কথা, বরাক নদীর কথা, বড়াইল পাহাড়ের কথা। উলা অন্তুকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক জায়গায় গেছে। উলা বোঝেনি মাথায় গামছা ও কাঁধে বন্দুদের ছবি দেখেছে সংবাদপত্রে, টিভি চ্যানেলে। উলা তো বুঝতে পারেনি এর মানে অন্তুর জন্য কাঞ্চনদা গামছায় মুখ মোছে এবং চোখও মোছে। এতে শোকের বার্তা বহন করে।

'হেড়ম্বপুরের প্রীতিকথা' গল্প সংকলনের নবম গল্পটি হল 'মৃত্তিকা কথা'। এই গল্পটি 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পকথক গল্পের চরিত্র খুঁজতে বেড়িয়েছেন। সে অনেক গল্প, উপন্যাস পড়েছেন এমনকি ছোটদের গল্প হান্স

অ্যান্ডারসন গ্রিমভাই পঞ্চতন্ত্র গোসাইবাগান হিতোপদেশও পড়ে দেখেছেন। তবুও সে ব্যর্থ হয়েছে। যশোবন্তপুর স্টেশনে গিয়েছে এক ঘন্টা আগে পৌঁছেছেন দুরন্ত ট্রেন ধরতে। এই প্ল্যাটফর্মেও খুঁজেছেন গল্পের চরিত্র। তার ছোটগল্প লেখার কথা শুনে গল্পকার শ্যামল সরকার রসিকতা করে বলেছিল কুমোরটুলিতে যেতে। সেখানে ঢেলা পাবে, রং পাবে এমনকি হেল্পারও পাওয়া যাবে। প্ল্যাটফর্মে দেখেন খয়েরি শাড়ির ধূসর পাড় একা দাড়িয়ে আছে একজন মহিলা, সে মোবাইলে কার সঙ্গে কথা বলছে।

'তিন ভুবন'-এর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখে মেয়েটি তার মায়ের কাগজ এবং মেয়েটি নিজের নাম বলে মৃত্তিকা রুদ্র। তার পিতার নাম প্রসন্ন রুদ্রপাল। প্রসন্ন রুদ্রপাল ছিলেন কুমোরটুলির কারিগর। লেখক রণবীর পুরকায়স্থ পাঠককে ধরিয়ে দিচ্ছেন। — ''ছোটগল্পের অকথিত পাঠ যে পাঠকমনে অশেষ সে কথা রবিঠাকুর বলেছেন। সমুদ্রপারে যে তরঙ্গ ভঙ্গ হয় তার একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। সেই ভাঙ্গা ঢেউটি যে আলাদা হল তারও একটি হয়ে ওঠার কথা আছে। ছোটগল্প হতে চায় সেই ঢেউয়ের মন। জলের অতল থেকে উঠে আসার কথা কোনও গল্প নয়, বিনোদন কথা নয় হিতোপদেশও নয়। ছোটগল্প মানে উন্মোচন, রহস্যের ছিপি খুলে বের করে আনা সত্য। সত্য জমে জমে জীবন। জীবনের নির্যাস। তাই হয়তো ছোটগল্পের সঙ্গে ছোট পত্রিকার নামও জড়িয়ে যায়।''[৪৪] গল্পকথক যশোবন্তপুরে ছিলেন যখন কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিনের মেলা চলছিল। গল্পকথকের ছেলে লুকা ওরফে ত্রৈলোক্য চাকরি ছেড়ে সিনেমা করবে এবং মৃত্তিকার খয়েরি শাড়ির ধূসর পাড়টাকে পাল্টাতে চাইছে। তাই সে বলে— ''তাই আপাতত যশোবন্তপুর পাথরবেদিকায় প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জনের মাঝামাঝি থাকুক আমার কথা। কথার মৃত্তিকা।''[৪৫] এই গল্পে লেখক সরাসরি পাঠকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ‘মিনির হাসি’, পৃঃ ১০

২. তদেব, পৃঃ ১২

৩. তদেব, পৃঃ ১০

৪. তদেব, পৃঃ ১১

৫. তদেব, পৃঃ ১১

৬. রঞ্জন আসছে, পৃঃ ১৪

৭. তদেব, পৃঃ ১৬

৮. তদেব, পৃঃ ১৭

৯. তদেব, পৃঃ ১৮

১০. ফুলমালার সংসার, পৃঃ ১২৪

১১. তদেব, পৃঃ ১৩৪

১১.ক তদেব, পৃঃ ১৩৪

১২. আসমান জমিন কথা, পৃঃ ১৬৯

১৩. তদেব, পৃঃ ১৭১

১৪. তদেব, পৃঃ ১৭৪

১৫. তদেব, পৃঃ ১৭৫

১৬. তদেব, পৃঃ ১৭৯

১৭. তদেব, পৃঃ ১৮১

১৮. তদেব, পৃঃ ১৬৯

১৯. ওদের কথা, পৃঃ ১৩৩

২০. তদেব, পৃঃ ১৩৫

২১. তদেব, পৃঃ ১৪২

২২. তদেব, পৃঃ ১৪২

২৩. তদেব, পৃঃ ১৪২

২৪. বাজার, পৃঃ ১৩

২৫. তদেব, পৃঃ ১৬

২৬. তদেব, পৃঃ ১০

২৭. যাহা যায়, পৃঃ ৯৪

২৮. তদেব, পৃঃ ৯৭

২৯. তদেব, পৃঃ ৯৮

৩০. তদেব, পৃঃ ৯৯

৩১. তদেব, পৃঃ ১০৭

৩২. বাজিকর, পৃঃ ৫৬

৩৩. তদেব, পৃঃ ৬৪

৩৪. তদেব, পৃঃ ৬৫

৩৫. তদেব, পৃঃ ৬৭

৩৬. তদেব, পৃঃ ৬৭

৩৭. অন্তর খোঁজে, পৃঃ ৬৯

৩৮. তদেব, পৃঃ ৭০

৩৯. তদেব, পৃঃ ৭২

৪০. তদেব, পৃঃ ৭৩

৪১. তদেব, পৃঃ ৭৩

৪২. তদেব, পৃঃ ৭৯

৪৩. তদেব, পৃঃ ৭৯

৪৪. মৃত্তিকা কথা, পৃঃ ১৩৮

৪৫. তদেব, পৃঃ ১৩৯